Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 322 – 327
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

দুঃখের স্বরূপ : ভারতীয় দর্শনের আঙ্গিকে

স্বপন সাহা
সহকারি অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
দেওয়ান আব্দুল গনি কলেজ, দক্ষিণ দিনাজপুর
ইমেইল : Swapanmithu555@gmail.com

Keyword
দুঃখ, সুখ, মুক্তি, মন, জন্ম, মৃত্যু, কর্ম, শরীর।

Abstract
সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জীবনেই 'ব্যাথা', 'বেদনা', 'যন্ত্রণা', 'কষ্ট', 'পীড়া'- এই শব্দগুলি দুঃখবাচক শব্দ বলেই পরিচিত। মনেরই কেবল 'দুঃখ' হয়। কি ভাবে দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? ভারতীয় দর্শনে চার্বাক ব্যাতীত সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় দুঃখের প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। দুঃখকে কি করে জানা যাবে? কোন একটি বিশেষ পশুকে কে (ধরা যাক গরুকে) নিশ্চয়তার সঙ্গে সবাই জানতে পারে বা প্রত্যক্ষ করতে পারে। 'অহং দুঃখী'– এই ভাবে নিজের দুঃখের মানস প্রত্যক্ষ হয়। কোন ব্যক্তিকে 'কাঁদতে' বা 'উফ' বলতে শুনলে বা কষ্ট জ্ঞাপক আওয়াজ বের করলে– মুখমালিন্যাদি হেতুর দ্বারা অন্যের দুঃখের অনুমান করা হয়। মনের দ্বারা শুধুমাত্র নিজের দুঃখকেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

ভোগবাদী ও ত্যাগবাদী কে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনিকগন দুই ভাগে বিভক্ত। ত্যাগবাদীদের মতে জগৎ দুঃখময় মরুভূমি, এখানে প্রকৃত সুখ বলে কিছু নেই যা আছে, তা সুখের আভাস মাত্র। ভগবাদি চার্বাকরা বলেন- "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ", অর্থাৎ যতদিন বাঁচবে, সুখে বাঁচবে, পরয়োজনে ঋণ করেও ঘি খাবে। বুদ্ধদেবের মনে হয়েছিল –'সুখের দ্বারা সুখ প্রাপ্য নয়, দুঃখের মধ্য দিয়েই সুখের আগমন ঘটে।জৈনরা বলেন, জীব স্বভাবত দুঃখ চাই না, সুখ অর্জন করতে গিয়ে অজ্ঞান বশতঃ দুঃখ অর্জন করে। মানুষের নিজকৃত কর্মের ফসল দুঃখ। ন্যায় মতে সুখ,দুঃখ, প্রযত্ন প্রভৃতি গুন আত্মার মধ্যে আবির্ভুত হয়। তারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মুলত অপবর্গ বলেন। সাংখ্যরা বলেন, এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মণ্ডে সকল বস্তুর অস্তিত্বকে সন্দেহ করা যেতে পারে, কিন্তু দুঃখের অস্তিত্বকে কোনভাবেই সন্দেহ করা যায় না। কারণ দুঃখ সর্বজন সম্মতিসিদ্ধ বলেই তাকে অস্বীকার করা যায় না। দুঃখের উচ্ছেদই হচ্ছে কৈবল্য। মীমাংসকদের মতে শরীর হল আত্মার সুখ-দুঃখ ভোগের আধার।নিষিদ্ধ ও কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান না করায় উৎপাদ্য ধর্ম-অধর্মের অনুপপত্তি হয় এবং জীব দেহের বিনাশ হয় এবং পুণর্জন্মের সম্ভাবনা না থাকায় জীব দুঃখ মুক্ত হয়ে থাকেন।উপসংহারে এসে বলা যায় সুখ-দুঃখ নিয়েই জীবের সংসার। সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথাও নেই, যেখানেই সুখ সেখানেই দুঃখ। মানুষ যদিও নিজের প্রচেষ্টায় সকল প্রকার দুঃখ দূর করতে পারলেও জরা-মৃত্য জনিত দুঃখ কখনই দূর করতে পারেনা। যতদিন শরীর থাকবে ততদিন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরামরণ জনিত দুঃখ থাকবে।

Discussion

সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জীবনেই 'ব্যাথা', 'বেদনা', 'যন্ত্রণা', 'কষ্ট', 'পীড়া'- এই শব্দগুলি দুঃখবাচক শব্দ বলেই পরিচিত। যদিও এই শব্দগুলির কোনটিই ঠিক হুবহু 'দুঃখ' শব্দের প্রতিশব্দ নয়। মনেরই কেবল 'দুঃখ' হয়। মন ও শরীর দুয়েরি হতে পারে 'ব্যাথা'। মানুষের শরীর ও মনের প্রয়োজনীয় কোন পদার্থের অভাবজনিত (ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি) –এই সবরকম দুঃখ যন্ত্রণার সাধারন কোন লক্ষন করা যায় কি?[১] 'সর্বাত্মনাং প্রতিকুল-বেদনীয়ম'- যা সকলের সর্বদা প্রতিকুল বলে বোধ হয় তা দুঃখ।[২] এই প্রবন্ধে দুঃখের স্বরূপ তুলে ধরা হবে এবং কি ভাবে দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? বলা যেতে পারে ভারতীয় দর্শনে চার্বাক ব্যাতীত সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় দুঃখের প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

দুঃখকে কি করে জানা যাবে? সবাই দুঃখ বলতেই বা কি বোঝে? কোন একটি বিশেষ পশুকে কে (ধরা যাক গরুকে) নিশ্চয়তার সঙ্গে সবাই জানতে পারে বা প্রত্যক্ষ করতে পারে। কিন্তু কারোর দুঃখকে অন্য কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। অনুরুপ ভাবে অন্যের দুঃখকেও প্রত্যক্ষ করা যায় না। 'অহং দুঃখী'– এই ভাবে নিজের দুঃখের মানস প্রত্যক্ষ হয়। কোন ব্যক্তিকে 'কাঁদতে' বা 'উফ' বলতে শুনলে বা কষ্ট জ্ঞাপক আওয়াজ বের করলে– মুখমালিন্যাদি হেতুর দ্বারা অন্যের দুঃখের অনুমান করা হয় অর্থাৎ অন্যের দুঃখ অনুমেয়। মনের দ্বারা শুধুমাত্র নিজের দুঃখকেই প্রত্যক্ষ করা যায়, অন্য ব্যক্তির দুঃখকে নয়।

"অন্যচ্ছ্রেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়স্তে..." - ১/২/১ কঠপনিসদ

যা প্রেয় তাই মানুষের পক্ষে শ্রেয় হতে পারে না। যা শ্রেয় তা প্রেয় নয়। শ্রেয়, প্রেয় হতে পৃথক। শ্রেয় ও প্রেয় কে বেদে সুখ লাভের দুটি প্রকার বলা হয়েছে ।শ্রেয় হল চিরকালের জন্য সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়। আর স্ত্রী, পুত্র,পরিবার,গৃহ, ধণ, সম্মান, যশ ইত্যাদি ইহোলোকের যত কিছু ভোগ্য সামগ্রী আছে, সে সকল প্রাপ্তির নির্দেশিত পথ হল শ্রেয়। ভোগের দ্বারা প্রত্যক্ষ এবং তাৎক্ষণিক সুখ পাওয়া যায়– এই ধারানার বশবর্তী হয়ে মানুষ প্রেয়র দিকে অগ্রসর হয়। আর কিছু মানুষ প্রাকৃত ভোগের আপাত মধুর এবং ভবিষ্যৎ দুঃখের রহস্য বুঝে, সে প্রেয়র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শ্রেয়র দিকে এগিয়ে যায়। সে সর্বত ভাবে সব রকম দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে অনন্ত, অসীম আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা লাভ করে।

ভোগবাদী (প্রেয়) ও ত্যাগবাদী (শ্রেয়) কে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনিকগন দুই ভাগে বিভক্ত। ত্যাগবাদীদের মতে জগৎ দুঃখময় মরুভূমি, এখানে প্রকৃত সুখ বলে কিছু নেই যা আছে, তা সুখের আভাস মাত্র। কেবমাত্র চার্বাকগন ভোগবাদী আর অন্যান্য দার্শনিকগন ত্যাগবাদী। তারা ভোগের জন্য সুখকে ক্ষণিক, স্বল্প বা দুঃখ মিশ্রিত বলে স্বীকার করে না। যদি কোন ব্যক্তি দুঃখের ভয়ে দৃষ্ট সুখ পরিত্যাগ করে, তবে সে পশুর ন্যায় মুর্খ বলেই বিবেচিত হবে। যদিও সুখ ভোগ করতে হলে দুঃখ ভোগ অপরিহার্য তথাপি ক্ষণিক, দুঃখমিশ্রিত হলেও, যে সুখটি বর্তমান মুহুর্তে আছে তাকে ত্যাগ করতে নেই। কারন অতীত তোমার নয়, ভবিষ্যৎ কে বিশ্বাস করতে নেই, কেবল বর্তমানই প্রত্যক্ষলব্ধ। তাই আগামীকাল ময়ূর লাভ অপেক্ষা, বর্তমানে যে কপোতটি আছে তার মুল্য অনেক বেশী। এই প্রসঙ্গে তাই ভগবাদি চার্বাকরা বলেন-

> "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ", অর্থাৎ যতদিন বাঁচবে, সুখে বাঁচবে, পরয়োজনে ঋণ করেও ঘি খাবে।"[৩]

উপরি উক্ত বক্তব্য থেকে সুশিক্ষিত চার্বাকরা প্রেয় থেকে শ্রেয়র দিকে এগিয়ে যায়। তারা সীমিত জৈব সুখকে অগ্রাহ্য করে, দুঃখকে বরন করে, অসীম অনন্তের সন্ধানে অগ্রসর হতে চায়। এই শ্রেণীর চার্বাকগন জৈব সুখকে সুখ বলে স্বীকার করে না। উপনিষদের ঋষির সাথে সুর মিলিয়ে বলে থাকেন- "ভুমৈব সুখম" অর্থাৎ ভুমা বা আনন্দই যথার্থ সুখ তাদের মতে আচার্য বৃহস্পতিও তাঁর "সুখমেব পুরুষার্থঃ"- এই সুত্রে সুখ বলতে বৃহতর সুখ বা আনন্দকেই বুঝিয়েছেন।

> "কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ"– এই সুত্রেও তিনি 'কাম' শব্দের দ্বারা জৈব আকাঙ্খাকে না বুঝিয়ে মানুষোচিত কামনাকেই বুঝিয়েছেন। সুতরাং জৈব সুখ নয়, আনন্দই মানুষের পুরুষার্থ।[৪]

বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্বে, বুদ্ধদেবের মনে হয়েছিল– 'সুখের দ্বারা সুখ প্রাপ্য নয়, দুঃখের মধ্য দিয়েই সুখের আগমন ঘটে'।[৫] এর পরই জগতের দুঃখের কারন খুজতে সতত চিন্তা মগ্ন হয়ে পড়লেন। জীবন দুঃখময়, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ

এবং দুঃখ নিরোধ মার্গ – এই দুঃখ রহস্য উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়েই তাঁর সাধনার সিদ্ধিলাভ। বুদ্ধদেব বলেছেন – 'সর্বং দুঃখম' অর্থাৎ জন্ম দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় জনের বিয়োগ দুঃখ, রোগ থেকে উৎপন্ন পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ। সুতরাং বলা যায় সকল কিছুই দুঃখময়। মানুষের এই অপর্যাপ্ত দুঃখ দেখে বুদ্ধদেব বলেছেন-

"অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিসসং অনিববিসং
গ্রহকারকং গবেসন্তো দুকখা জাতি পুনপপুনং।।"

অর্থাৎ (দেহরূপ) গৃহের নির্নাতার সন্ধানে কত জন্ম আমি সংসারে ভ্রমণ করলাম, কিন্তু তাকে পেলাম না। বার বার জন্ম গ্রহণ করা দুঃখ জনক।[৬] তৃষ্ণার জন্যই জীবের বার বার জন্মমৃত্যু হয়। পৌনর্ভব হল তৃষ্ণার অপর নাম। কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা – এই তিন প্রকার তৃষ্ণার মধ্যে বিভবতৃষ্ণাই সর্ব দুঃখের উৎস। তৃষ্ণাকে দুঃখের কারন বলা হলেও অবিদ্যাই দুঃখের মুল কারন।মানুষ অবিদ্যাপ্রসূত কর্মের জন্য জন্ম-মৃত্যু শৃঙ্খলে বন্দি হয়। সম্যক জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা নাস করে নির্বান লাভের মাধ্যমে মানুষ এই জন্মরূপ দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে।বুদ্ধদেব তাই বলেছেন-

"কশাঘাত ক্লিষ্ট ভদ্র অশ্ব যেমন ক্ষিপ্র ও বেগবান হয়, তেমনি শ্রদ্ধা, শীল, বীর্য, সমাধি ও ধর্ম বিনিশ্চয় প্রজ্ঞায় বিদ্যাচারণ সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হও। তাহলে দুঃখকে অপনোদন করতে পারবে।"[৭]

"কো দুঃখমাপুয়াৎ কস্য সৌখ্যৈর্ণ বিস্ময়ো ভবেৎ।
কশ্চ ন লভেত মোক্ষং রাগদ্বেষৌ যদি ন ভবেতাম।।"

জৈনরা অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ের মত দুঃখ নিবৃত্তিকেই প্রাথমিক ভাবে মোক্ষ বলেছেন। জীব স্বভাবত দুঃখ চাই না, সুখ অর্জন করতে গিয়ে অজ্ঞান বশতঃ দুঃখ অর্জন করে। পথ ভ্রান্ত হয়ে, দুঃখময় ভব সাগরে নিপতিত হয়। তবে হতাশ হবার কারন নেই,সঠিক পথ অনুসরণ ক্রলে,দুঃখের মেঘ কেটে গিয়ে সুখের সূর্য উদয় হবে।[৮] কাম, আসক্তি, প্রমাদ, কষায় এবং আস্রব মিথ্যা দর্শন হতে জন্মে। মিথ্যাদর্শনই বন্ধন তথা দুঃখের মুল কারন। জৈন দর্শনে বলা হয়েছে – "আস্রাবো ভভেতুঃ স্যাৎ সংবরো মোক্ষ কারণম" অর্থাৎ আস্রব সংসারের হেতু এবং সংবর মোক্ষের কারন। 'আস্রব' শব্দের অর্থ দুঃখ, কষ্ট, পীড়া। কিন্তু জৈন দর্শনে 'আস্রব' শব্দটির অর্থ পথ বা দ্বার। আস্রব হচ্ছে জীবের চলন। জীবের স্বরূপ নষ্ট করে তাকে বন্ধনের দিকে নিয়ে যায়।আর আস্রবের নিরোধে কর্মপুদ্গল গুলো জীবে প্রবেশ করে না বলে আস্রব নিরোধ কে সংবর বলে। মুক্তি লাভের প্রথম প্রক্রিয়ার নাম সংবর এবং দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার নাম নির্জরা। জীবের মধ্যে নতুন পুদ্গালের অনুপ্রবেশ বন্ধ করাকে বলে সংবর। আর ফলে নতুন কর্মের উদয় হয় না। নির্জরার দ্বারা সঞ্চিত কর্মের নাশ হয়। এভাবে সমস্ত কর্ম হতে মুক্তি লাভ ঘটে একেই বলে মোক্ষ।

বাসনাদির অধিন হয়ে অসৎ কর্মের ফলে সে পশুবৎ পরতন্ত্র দুঃখী হয়। মানুষের নিজকৃত কর্মের ফসল দুঃখ, একথা সত্য; সুতরাং বলা যায় মুক্তি ও তার নিজের প্রযত্নের ফসল, সে কল্পনা প্রবণ নয়, আত্মশক্তিতে পুর্ণবিশ্বাসী। সে জন্যই সে বলতে পারে-

"জীবনাং ভদন্ত! কিমাত্মকৃতং দুঃখং পরকৃকতং দুঃখং তদুভয়কৃতং দুঃখম?
আত্মকৃকতং দুঃখং ন পরকৃকতং দুঃখং নো তদুভয়কৃতং দুঃখম।।"[৯]

ন্যায় মতে সুখ, দুঃখ, প্রযত্ন প্রভৃতি গুন আত্মার মধ্যে আবির্ভুত হয়, যখন আত্মা মনের সঙ্গে যুক্ত হলে এবং মন, ইন্দ্রিয় ও বাহ্যবস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়। দেহ ও মনের সঙ্গে আত্মার এই সংযোগ ঘটলে, আত্মা বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে দুঃখ ভোগ করে। মহর্ষি গৌতম তাই দুঃখের সুত্রে বলেছেন- 'বাধনা লক্ষণং দুঃখম' (ন্যায় সুত্র-১/১/২১) অর্থাৎ সমস্ত প্রমেয়ই বাধনালক্ষণ অর্থাৎ দঃখানুষক্ত দুঃখ। জীবের কাম্য বস্তুই হল সুখ এবং দুঃখ নিবৃত্তি। সংসারী জীব সুখের আশায় বহু দুঃখ ভোগ করে, এখন তারা নিতান্তই বিরক্ত। তারা দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের জন্য বহু সুখও পরিত্যাগ করে বলেন,

"আর দুঃখ চাই না, এখন এই সমস্ত যন্ত্রনা হতে অব্যাহতি পেলেই বাঁচি, সুখ চেয়ে স্বস্তি ভালো।"[১০]

এখানে দুঃখ নিবৃত্তিই হল স্বস্তি বা শান্তি। সুখ ভোগ করেত হলে দুঃখ ভোগ অবশ্যই করতে হবে। কেননা সুখ মাত্রই দুঃখানূষক্ত। অর্থাৎ দুঃখ শুন্য চিরস্থায়ী কোন সুখ নাই। তারা সুখ-দুঃখ শূন্য অবস্থাই প্রার্থনা করে চিরশান্তি লাভের জন্য এবং তাই হল চরম পুরুষার্থ। চিরশান্তির চরম ব্যাখ্যায় কোন পূর্বাচার্য্যও বলেছেন-

"ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা না দ্বেষারাগৌ নচ কাচিদিচ্ছা।" [১১]

নৈয়ায়িকরা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মুলত মোক্ষ বা অপবর্গ বলেন। মহর্ষি গৌতম বলেছেন- দুঃখের সম্পুর্ণ বিনাশই অপবর্গ। তাই ন্যায় সুত্রে বলা হয়েছে- "তদত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গঃ" (ন্যায় সুত্র- ১/১/২২) অর্থাৎ সমস্ত দুঃখের সাথে অত্যন্ত মুক্তিই অপবর্গ। মহর্ষি কনাদের মতে অদৃষ্টের অভাবে কর্মপ্রবাহ সম্পুর্ণ রুদ্ধ হয়, এবং আত্মা ও দেহের সম্বন্ধও একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধও চিরকালের জন্য সমাপ্ত হ্য।তাই তিনি বলেছেন-

> "তদভাবে সং যোগাভাবোহপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ।" (বৈ, সু – ৫/২/১৮) দেহের সঙ্গে সম্বন্ধের অভাবে দুঃখ তেকে জীবের পরিত্রান হয়। এই দুঃখ মাত্রই অপবর্গ।[১২]

আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর 'সাংখ্যকারিকায়' বলেছেন- 'দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ'– এই পদটির দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, 'তত্র ন তাবদ দুঃখং নাস্তি নাপি অজিহাসিতম' অর্থাৎ দুঃখ আছে এবং অবশ্যই তা অজিহাসিত নয়।[১৩] এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মণ্ডে সকল বস্তুর অস্তিত্বকে সন্দেহ করা যেতে পারে, কিন্তু দুঃখের অস্তিত্বকে কোনভাবেই সন্দেহ করা যায় না। কারণ দুঃখ সর্বজন সম্মতিসিদ্ধ বলেই তাকে অস্বীকার করা যায় না। আর সর্বসম্মত বলেই দুঃখ প্রত্যাত্মবেদনীয়। এর পরও যদি কেও বলেন যে, দুঃখ নামক কোন পদার্থ এ জগতে নেই।তাহলে তাকে বলতে হয় যে, জীবনে কোন দিন দুঃখের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি এমন কোন প্রানি নেই। যে এই কথা বলবে যে, একবারও সাক্ষাৎ হয়নি, সে মিথ্যাবাদী একথা দৃঢ় ভাবে বলা যায়। প্রত্যেক প্রাণীর কোটি কোটি দুঃখ।

সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে- দুঃখের মুলে হচ্ছে রজঃগুণ। রজঃ দুঃখ উৎপাদক। সাংখ্যদের পঞ্চবিংশতি তত্বে দুঃখের উল্লেখ না থাকলেও রজঃগুণের উল্লেখ আছে। রজঃগুণের একপ্রকার পরিণামকেই বলে দুঃখ। দ্বেষ, ক্রোধ, অহংকার প্রভৃতি রজঃগুণের নানা প্রকার পরিণাম। এই পরিণাম গুলির মধ্যে দুঃখ যে একপ্রকার তা বোঝাবার জন্য বাচস্পতি বলেন দুঃখ হল 'রজঃপরিনাম ভেদঃ'।[১৪] রজঃগুণের পরিণাম বিশেষ হওয়ায় দুঃখকে কেও প্রত্যাক্ষান করতে পারে না। সাংখ্য মতে তিনপ্রকার দুঃখের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি হল- ১) আধ্যাত্মিক দুঃখ, ২) আধিভৌতিক দুঃখ এবং ৩) আধিদৈবিক দুঃখ। জীবজগতের সকল দুঃখই উপরি উক্ত তিন প্রকার দুঃখের অন্তর্গত।

সাংখ্য মতে আত্মা বা পুরুষের কখনোই দুঃখ থাকতে পারে না। কারণ পুরুষ নিত্য ওঃ মুক্ত। আধ্যাত্মিক দুঃখে 'আত্মা' শব্দের দ্বারা শরীর ওঃ মনকে বোঝানো হয়েছে। কাজেই আধ্যাত্মিক দুঃখ বলতে, শারীরিক দুঃখ ও মানসিক দুঃখকে বোঝানো হয়েছে। যদিও দুঃখ বলতে মনেরই ধর্মকে বোঝায় তবুও মানস দুঃখ দ্বারা মনোমাত্র দুঃখকে বোঝানো হয়েছে। শারীরিক দুঃখ হচ্ছে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্যবশত ব্যাধি। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সাম্য থাকলে শরীর সুস্থ থাকে, আর বৈশম্য হ্লেই শরীরে ব্যাধি হ্য।ব্যাধি জন্য দুঃখকে শারীরিক দুঃখ বলে, কেননা ব্যাধি শরীরেরই হয়। অপর দিকে কাম, ক্রধ, ঈর্ষা, ভয়, প্রিয়োবিয়োগ ও অপ্রিয়ো-সংযোগের ফলে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তগকে মানসিক দুঃখ বলা হয়। উপরি উক্ত দুঃখ গুলি আন্তর উপায়ের দ্বারা উৎপন্ন হয় বলে এদের আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে।

আধিভৌতিক দুঃখ এবং আধিদৈবিক দুঃখ বাহ্যকারণের দ্বারা উৎপন্ন হয়। আধিদৈবিক শব্দের অন্তর্গত 'ভূত' শব্দের দ্বারা 'বৃক্ষ-পর্বতাদিকে' এবং 'জঙ্গম' শব্দের দ্বারা 'মানুষ পশু' প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে। মানুষ, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ, পতঙ্গ এবং পস্তরাদির দ্বারা উৎপন্ন দুঃখ আধিভৌতিক। আর আধিদৈবিক শব্দের অন্তর্গত 'দেব' শব্দের দ্বারা দেবযোনিকে বোঝানো হয়েছে। দেবযোনি বলতে বোঝায় বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যকসিদ্ধ ও ভূত-পেতকে। গ্রহাবেশ হলেও দুঃখ হয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, উল্কাপাত প্রভৃতি থেকে উৎপন্ন দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ বলা হয়। যদিও এই সব দুঃখকে অনেকে বলে থাকেন আধিভৌতিক। সাংখ্য মতে উক্ত ত্রিবিধ দুঃখ ভোগই হচ্ছে আত্মা বা পুরুষের বন্ধনের কারণ এবং এই ত্রিবিধ দুঃখের উচ্ছেদই হচ্ছে কৈবল্য।

মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি জৈমিনি তাঁর 'মীমাংসা সূত্র' গ্রন্থে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির (মোক্ষ বা মুক্তি) কোন আলোচনা করেননি। তিনি শুধু বেদের কর্ম কাণ্ডের ব্যাখ্যা করেছেন এবং তা করতে গিয়ে যজ্ঞাদি কর্ম হতে উৎপন্ন যে স্বর্গরূপ ফলের কথা বলেছেন। কিন্তু কোথাও সেই স্বর্গ হতে মুক্তির কথা উল্লেখ করেননি। পরবর্তীকালে মীমাংসকদের মধ্যে মোক্ষকে পুরুষার্থ বলে স্বীকার করার ঝোঁক পরিলক্ষিত হলেও প্রভাকর মিশ্র ও কুমারীল ভট্ট মোক্ষ বিষয়ের আলোচনাকে গুরুত্ব না দিলেও তাদের অনুগামীরা পরবর্তীকালে মোক্ষের আলোচনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

মীমাংসকদের মতে শরীর হল আত্মার সুখ-দুঃখ ভোগের আধার। মানুষের শরীর জরায়ুজ, পতঙ্গাদির শরীর অন্তজ, মশকাদির শরীর স্বেদজ ও বৃক্ষাদির উদ্ভিজ্জ ভেদে শরীর চার প্রকার। প্রভাকর মীমাংসক উদ্ভিজ্জ শরীর স্বীকার করেন না। কেননা তাতে ইন্দ্রিয়ের আধার থাকে না। কুমারীল সম্প্রদায় প্রভাকরের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেন, বৃক্ষেরও সুখ-দুঃখের অনুভব আছে, তাই ইন্দ্রিয়েরও কল্পনা করতে হবে। ভাট্ট মতে সুখ-দুঃখ হচ্ছে আত্মা বা জীবের গুণ। সুখ-দুঃখ অনুভব বেদ্য। ঐহিক ও পারত্রিক ভেদে দুঃখ দ্বিবিধ। ঐহিক দুঃখ হল রোগাদিজনিত আর রৌরব মহারৌরবাদি নারকীয় দুঃখ পারত্রিক। অধর্ম হল এই দ্বিবিধ দুঃখের কারণ। ধর্ম ও অধর্ম বিনাশে সুখ-দুঃখের বিনাশ হয়। উপভগ, নিত্য, নোইমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান এবং আত্ম জ্ঞানের দ্বারা ধর্ম- অধর্মের বিনাশ উৎপন্ন হয়। নিষিদ্ধ ও কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান না করায় উৎপাদ্য ধর্ম-অধর্মের অনুপপত্তি হয়। এই অবস্থায় জীব দেহের বিনাশ হয় এবং পুণর্জন্মের সম্ভাবনা না থাকায় জীব দুঃখ মুক্ত হয়ে থাকেন।[১৫]

প্রভাকর সম্প্রদায়ের মতে সংসারে আত্যন্তিক সুখ নেই। সংসার সুখ অস্থির। কর্মফল ভোগের জন্য জীবকে বার বার সংসারে জন্মগ্রহণ করতে হয়। নিত্য, নৈমিত্তিক ও নিস্কাম কর্মের মাধ্যমে সুখ-দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হয়। আর সর্বপ্রকার দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশকেই মুক্তি বলে। আত্মজ্ঞান হতে মুক্তি লাভ হ্য।ধর্ম- অধর্মকে ভোগের দ্বারা ক্ষয় করে সকল প্রকার কর্মফলকে নঃশেষে বিনাশ করলে জীব মুক্ত হয়ে থাকে। তার আর জন্ম হয় না। 'প্রকরণপঞ্চিকাতে' শালিকনাথ বলেছেন –

"আত্যন্তিকো দেহোঃচ্ছেদঃ নিঃশেষধর্ম্মাধর্ম্মপরিক্ষীণো মোক্ষঃ"

অর্থাৎ কর্ম প্রসূত সমস্ত ধর্মাধর্মের ঐকান্তিক বিলোপই মোক্ষ।[১৬]

কুমারীল ভট্ট বলেন, 'ভূমানন্দস্বরূপ মোক্ষ দুঃখের আত্যন্তিক অভাবস্বরূপ'। তাই এই অবস্থা নিত্য। আর নিত্য সুখের অনুভূতি হল মুক্তি। নারায়ণ ভট্ট তাঁর 'মানমেয়োদয়ে' বলেছেন-

"দুঃখোত্যন্তসমুচ্ছেদে সতি প্রাগাত্মবর্ত্তিনঃ।
আনন্দ স্যানুভূতিস্তু মুক্তিরুক্তা কুমারিলৈঃ।।"

অর্থাৎ দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হলে তখন আত্মাতে পূর্ব থেকে বিদ্যমান নিত্যান্দের যে অনুভূতি হয়ে, কুমারীল ভট্ট তাকেই মুক্তি বলেছেন। নারায়ণ ভট্ট আরো বলেন যে, যদি মুক্তিতে আনন্দের অনুভূতি হয়, তবে 'অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়া-প্রিয়ে ন স্পৃশতঃ' অর্থাৎ শরীর না থাকলে সুখ-দুঃখের অনুভব থাকে না।[১৭] সুখ-দুঃখ ভোগের দ্বারা যার প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয়, আর যিনি শমদমাদি অঙ্গের সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্বক যোগ সাধনা করে আত্মবিচার করেন তখন নিত্যানন্দরূপ মুক্তির অভিব্যক্তি ঘটে বলে ভাট্ট সম্প্রদায় মনে ক্রেন। প্রার্থসারথি প্রাঞ্জল ভাষায় বলেন- "নিরানন্দো মোক্ষঃ; দুঃখপরিলোপাচ্চ পুরুষার্থত্বম" অর্থাৎ মোক্ষদশায় জীবের কোন আনন্দ থাকে না, দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হয় বলেই মোক্ষ পুরুষার্থ।[১৮]

চার্বাক ব্যাতীত সকল ভারতীয় দর্শনে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকে বলা হয়েছে মোক্ষ। কিন্তু কেবলাদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে মোক্ষ হল দুঃখভাব মাত্র নয়। আন্নদস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ পরমানন্দপ্রাপ্তি, যে চিরস্থায়ী আনন্দকে জীবমাত্রই পরম প্রয়োজন মনে করে, সেই আনন্দপ্রাপ্তি।[১৯] জীবের সাথে ব্রহ্মের অভিন্ন হয়ে যাওয়ায় আন্নদস্বরূপ। আর মায়া, অবিদ্যা বা অজ্ঞান এর কারনেই জীব কর্ম করে দুঃখ লাভ করে। বেদান্ত সূত্রে বলা হয়েছে, ব্রহ্মকেও জগৎ সৃষ্টির জন্য জীবের কর্মের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। বাস্তব জগতেও মানুষের মধ্যে সুখ-দুঃখের বৈশম্য দেখা যায়, অনেকে শ্রম করেও অনাহারে থাকে, আবার কেও বিনা শ্রমেই ভোগ বিলাসে জীবন কাটান। পূর্ব জন্মের কর্মফলই নির্ধারন করে দিচ্ছে এই জন্মে সে সুখ ভোগ করবে না দুঃখ ভোগ করবে- বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই কথা বলা আছে। "অসতো মা সদ্গময়ঃ মৃতোর্মা অমৃতং গময়ঃ" (বৃহদারণ্যক– ১/৩/২৮) এখানে অসত্য বলতে অবিদ্যাকে বোঝানো হয়েছে। "অজ্ঞানেন আবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" (গীতা - ৫/১৫)। এখানে অজ্ঞানের কারনে যে জ্ঞান আবৃত আছে, তার জন্য জীবগণ মোহগ্রস্ত হয়। অদ্বৈতবেদান্তবাদী শঙ্করের মতে কর্মের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। ফলে জীব দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করে।

উপসংহারে এসে বলা যায় সুখ-দুঃখ নিয়েই জীবের সংসার। সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথাও নেই, যেখানেই সুখ সেখানেই দুঃখ। মানুষ যদিও নিজের প্রচেষ্টায় সকল প্রকার দুঃখ দূর করতে পারলেও জরা-মৃত্য জনিত দুঃখ কখনই দূর করতে পারেনা। যতদিন শরীর থাকবে ততদিন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরামরণ জনিত দুঃখ থাকবে। তাই বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেছেন–"উপরে ব্রহ্মা হইতে আরাম্ভ হইয়া নীচে বৃক্ষাদি স্থাবর প্রাণী পর্যন্ত সকলেই জ্রা-মৃত্যু জনিত দুঃখের অধীন।" মানুষ জ্ঞানের দ্বারা দুঃখ কিছুটা লাঘব করতে পারেন, যে ব্যক্তি যত জ্ঞানি তার দুঃখ তত কম। আর যিনি যে পরিমাণে অজ্ঞ তিনি সেই পরিমাণে দুঃখী। এ প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকরা বলেন যে, দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে হলে আত্মা থেকে সবরকম বিষয়ের জ্ঞানকেও মুছে ফেলতে হয়। কারণ তাদের মতে জ্ঞান মাত্রই বিষয় নির্ভর, আর যা বিষয় নির্ভর তাই পরনির্ভর। অর্থাৎ 'সর্বং পরবশং দুঃখম'। কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক মুক্তি হলেই জীব দুঃখ মুক্তির বাসনা থেকে মুক্তি পাই।

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী, অরিন্দম, মননের মধু, গা ঙ চি ল, অগস্ট, ২০০৮, পৃ. ১৬০
২. শ্রীকেশব মিশ্রবিরচিতা, তর্কভাষা, বঙ্গানুবাদ–বিবৃতিসহিতা দ্বিতিয় খণ্ড – শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য
৩. মণ্ডল, প্রদ্যোতকুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, মার্চ, ১৯৯৯, পৃ. ৬৫
৪. শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, চার্বাক দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, বৈশাখ, ১৩৬৬, পৃ. ১১১
৫. বসু, রণদীপম, চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শন (জৈন ও বৌদ্ধ), রোদেলা প্রকাশনী, একুশে বইমেলা, ২০১৭, পৃ. ১৪১
৬. গুপ্ত, মিহির, ধম্মপদ- সম্পাদনা– রণব্রত সেন, হরফ প্রকাশনী, শ্রাবণ, ১৩৮১, পৃ. ১০০
৭. বসু, রণদীপম, চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শন (জৈন ও বৌদ্ধ), রোদেলা প্রকাশনী, একুশে বইমেলা, ২০১৭, পৃ. ১৬৬
৮. পাল, ডঃ বিপদ্‌ভঞ্জন, ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, সেপ্টেম্বর, ২০১৪, পৃ. ৮৬
৯. পূর্ববৎ, পৃ. ৮৯
১০. তর্কবাগীশ, ৺ফণীভূষণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, নভেম্বর, ১৯৭৮, পৃ. ৬
১১. পূর্ববৎ, পৃ. ৬
১২. পাল, ডঃ বিপদ্‌ভঞ্জন, ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, সেপ্টেম্বর, ২০১৪, পৃ. ৩০০
১৩. গোস্বামী, শ্রীনারায়ন চন্দ্র, ঈশ্বরকৃষ্ণকৃতা সাংখ্যকারিকা শ্রীমদবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৬, পৃ. ১০
১৪. পূর্ববৎ, পৃ. ১৩
১৫. ভট্টাচার্য, সুখময়, পূর্বমীমাংসা দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, এপ্রিল, ১৯৮৩, পৃ. ২০৩
১৬. বসু, রণদীপম, চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শন (পূর্বমীমাংসা), রোদেলা প্রকাশনী, একুশে বইমেলা,২০১৭, পৃ. ২৩৮
১৭. ভট্টাচার্য, সুখময়, পূর্বমীমাংসা দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, এপ্রিল, ১৯৮৩, পৃ. ২০১
১৮. পূর্ববৎ, পৃ. ২০৩
১৯. মিশ্র, প্রভাত, শঙ্করের দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৯, পৃ. ১০৯